ভণ্ড

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

জলছবি প্রকাশন

ভণ্ড

জমীম উদ্দীন মুহম্মদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
ব্লক-বি, সড়ক নং ৬, শেখেরটেক
আদবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
আর. করিম

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা

ISBN : 978-984-94525-9-1

মূল্য ৩০০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

facebook.com/JalchobiProkashon
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭

Copyright @ Writer

Vando, Written by **Jasim Uddin Mohammad**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2020, Price Taka 300, US $ 7

উৎসর্গ

আমার আজন্ম পাঠক পিতা পরম শ্রদ্ধাভাজন
মো ঃ আবদুল হামিদ
এবং মমতাময়ী মা পরম শ্রদ্ধাভাজন
আয়েশা আক্তার

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

১। খুঁজে চলেছি যারে (কাব্য)
২। ভালোবাসার নির্বাচিত কবিতা (কাব্য)
৩। ডাম্বুলাব প্রেম (গল্প সংকলন)
৪। শেষপত্র (পত্রকাব্য)
৫। কবিতা উল্লেখ্য (সম্পাদিত কাব্য)
৬। নগ্নপদ ছায়া (সম্পাদিত কাব্য)
৭। আবশি যৌথকাব্য সংকলন-০১ (সম্পাদিত)
৮। আবশি যৌথকাব্য সংকলন-০২ (সম্পাদিত)
৯। আবশি (সম্পাদিত লিটলম্যাগ)
১০। ছোটদের সাহিত্য (সম্পাদিত লিটলম্যাগ)

মুখবন্ধ

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। যখন সাহিত্যের একটা শিল্পমূল্য ছিল। সবশ্রেণি-পেশার অগণিত পাঠক ছিল। আর এখন পাঠক যেমন নেই, তেমনি নেই মানসম্মত বই। বলা চলে সাহিত্য ছাড়া জীবন অসম্ভব এবং অসম্পূর্ণ। তাহলে কেনো এই আকাল? কেনো ফিরে আসছে না সাহিত্যের সোনালি দিন? অথচ আগের তুলনায় এখন লেখকের সংখ্যা ঢের বেশি। কিন্তু তারা পাঠক সৃষ্টি করতে পারছেন না। আমি জানি না এ দৈন্যতার দায় কার! তবে আমি বিশ্বাস করি, কাউকে না কাউকে অবশ্যই এর দায়ভার নিতে হবে। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি পাঠকের ভালোবাসা ফিরিয়ে আনতে হবে। এটা করতে না পারলে জাতি হিসাবে আমরা হাজার হাজার বছর পিছিয়ে যাবো।

আমি মূলতঃ কবিতা লিখি। কবিতার সাথেই আমার আজন্ম বসবাস। আমি কবিতায় বাঁচি। কবিতায় মরি। তবে মাঝেমাঝেই ছোটগল্পের সাথে সখ্যতা হয়, । মন দেওয়া-নেওয়া হয়। সেই হিসাবে উপন্যাস লেখার সাহস করা আমার জন্য একপ্রকার ধৃষ্টতা বৈকি। কথায় আছে, 'হাতি-ঘোড়া গেলো তল, ব্যাঙ বলে কতো জল'! আমারও হয়েছে তেমনি লেজে-গোবরে অবস্থা! যেহেতু আমি মূলতঃ একজন কবি,তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার উপন্যাসটি কিছুটা চেতনে এবং কিছুটা অবচেতনে হয়ে উঠেছে কাব্যনির্ভর। তবে দুরারোগ্য নয়। সুপ্রিয় পাঠকগণ, উপন্যাসটিতে একই সাথে কথাসাহিত্য এবং কাব্যিক আমেজ প্রাণভরে উপভোগ করতে পারবেন বলে আমার গভীর বিশ্বাস। অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ উপন্যাসটিতে জীবন সমুদ্রের একেবারে তলদেশে ডুব দেয়ার মতন প্রচুর উপায়-উপকরণ রয়েছে। তবুও চূড়ান্ত বিচারিক ক্ষমতা সম্মানিত পাঠকের। আমি শুধু এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, উপন্যাসটি পাঠে সম্মানিত কোনো পাঠকই ঠকবেন না। আপনি যে শ্রেণির পাঠকই হউন না কেনো ভণ্ড আপনাকে ছুঁয়ে দিবেই।

উপন্যাসটির নামকরণ নিয়ে আমার নিজের সাথে নিজের মল্লযুদ্ধ একেবারে কম হয়নি। একবার ভেবেছি উপন্যাসটির নাম দেবো 'যে বসন্তে ফুল ফুটেনি'। পরক্ষণেই আবার ভেবেছি নাম দেবো 'ভণ্ড'। সবশেষে উপন্যাসটি লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি।

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ
সহযোগী অধ্যাপক, সবকারী আনন্দ মোহন কলেজ
ময়মনসিংহ।

এক

প্রেমহীন জীবন কার ভালো লাগে? অবশ্যই কারো ভালো লাগে না। ভালো লাগতে পারে না। ভালোলাগার কথাও নয়। তবুও কিছু কিছু স্বঘোষিত তথাকথিত মহাজন আছেন, যারা মনে করেন প্রেম বলতে আসলে কিছুই নেই। তাদের মতে, প্রেম হলো হাত-পায়ের বাড়তি নখ অথবা মাথার চুলের মতন মৃতকোষী এবং পরজীবী। এইসব উচ্ছিষ্টদের আগলে রাখলে যেমন জীবন চলে যায়; তেমনি কেটে বাদ দিলেও জীবন থেমে থাকে না। প্রেমও এমনি এক উচ্ছিষ্টের নাম। তবে আমি এই অতিবাস্তববাদীদের দলে নই। আমার একটি টুনটুনি মন আছে। সেই মনে টুনাটুনির সংসার পাতার লাল, নীল, বেগুনি স্বপ্ন আছে। সেই স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকার মত অসংখ্য অনুষঙ্গ আছে। তবে এটাও আমি অস্বীকার করি না যে, সেইসব অনুষঙ্গের কেউ কেউ আবার বিষকাঁটালির কাঁটার মত; যাদের আমি গিলতেও যেমন পারি না, আবার বমি করে উগড়ে দিতেও পারি না। তবে আমি ঝিকর গাছের আঠার মত বিশ্বাস করি, আমাদের এই জীবন হাসি-তামাশা আর ক্রীড়া-কৌতুক বই অন্যকিছুই নয়। তবে এই ক্রীড়া-কৌতুকের হীরার টুকরোর মত যেমন নগদ দাম আছে; তেমনি কাঁচা পয়সার মতন উড়ন্ত পাখা আছে। কারণ মানুষ গরু, ছাগল কিংবা ভেড়া নয়; মানুষ কেবলই মানুষ! যে মোহ দিয়ে মানুষের সৃষ্টি, সেই মোহমুক্তি লাভ করাই মানব জীবনের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ।

সবাই বসন্তের বন্দনা করে। ফুল, পাখি, প্রকৃতি নিয়ে জীবনের জয়গান করে। ঝড়ে, বিনা ঝড়ে জীবনের আলোড়ন তোলে। কেউ কেউ পথে থেকে যেমন সেই আলোড়ন তোলে আবার কেউ কেউ পথ ভুলেও তোলে! আমি কী করব? আমার যে বসন্ত থেকেও নেই। যে ছিল একদিন আজ সেও নেই। যে আছে, সে থেকেও নেই। আমি কার কথা বলব? তাও আবার এখন আমার এসব কিছু খুব একটা মনেও নেই। ডাল আর চালের খিচুরির স্বাদ খুঁদকুড়ো দিয়ে কতটা পাওয়া যায়? কতটা পাওযা সম্ভব? তবুও নিজের হৃদয়ের তারিফ নিজেই করছি। কারণ পাকস্থলি থেকে একটা অশিষ্ট বের করে আনার এই যে আমার বৃথা চেষ্টা তাও বা কম কিসে? ঘাট মানছি, এ আমার চেষ্টা নয়; অপচেষ্টা অথবা প্রচেষ্টা। অনেকদিন উপসর্গ, অনুসর্গ, বিসর্গ, নিসর্গ এদের দেখি না। ওরা এখন চাঁদে আছে নাকি মংগলে আছে তাও যথার্থ জানি না। আমি যে মনোরমার কথা বলার জন্য এত এত ফিরিস্তির আঞ্জাম দিচ্ছি,তা এখন মেঘে ঢাকা সুন্দরি চাঁদের মত আবছা আবছা। তবুও মেঘপাতার

ফাঁক গলে গলে যতটকু জোছনা পৃথিবীতে পালিয়ে আসতে পারে; ঠিক যেন আমার ততটুকু মনে আছে। আর আমিও এমনি এক সিকিমানুষ; আমার বেশি আলোতে যেমন দিন চলে যায়, তেমনি অন্ধকারেও দিন আটকে থাকে না।

তবে এতোটুকু মনে আছে, যে সময়কে আমি এখন ডানহাতের তালুবন্দি করতে চাচ্ছি; সে আমার দিগম্বরবেলা; তখন হাত বাড়ালেই নীলার এত দুরন্ত, সুস্বচ্ছ নীলাকাশ ছোঁয়া যেত। ডানপিটে বাতাসের সাথে হৃদয় উজাড় করে কথা বলা যেত। পাখির বাসায় টুনটুনির ছানা হওয়া যেত। হিজলের শাখায় বসন্তের কোকিল হওয়া যেত। বন্যার বাড়ন্ত জলে সোহাগী হাঁস হওয়া যেত। ধানক্ষেতের আইল ধরে লালপরী, নীলপরী, মেঘপরী হওয়া যেত। ওরা যখন হেঁটে যেত তখন ওদের পায়ের ঘুঙুরের ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ হওয়া যেত। সেই আওয়াজ শুনে প্রজাপতির মত ওদের পিছু ধাওয়া করা যেত। যে ডানাকাটা সময়ের কথা বলছি, তখন আমার কোনো পিছুটান নেই। অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম ভাবনা নেই।

কেবল দুই হাতের তালুতে উত্তপ্ত বালুকারাশির চামচিকার মতন সারাদিন চিৎকার আছে। চেঁচামেচি আছে। তবুও কোথাও কোনো শব্দজট হতো না। লাল পেড়ে ওড়না শাড়ির মতো করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সে আমার সাথে সমান তালে দৌড়ের পাল্লা দিতো। আমি ইচ্ছে করেই কখনও কচ্ছপ হতাম; আর সে হতো খরগোশ! সেই ছোট্ট সকালে যেই ওড়নাকে আমি মনে মনে শাড়ি ভেবেছিলাম; সেই ওড়না এখন রীতিমত, দস্তুরপুরো বারো হাত শাড়ি। ভাবতেই আমার খুব অবাক লাগে, আমাদের সেই সকালবেলাটা এখন আর নেই। মেঘে-রোদ্দুরে বেলার জল বেশ খানিকটা গড়িয়েছে। সে এখন হাইস্কুলের প্রাচীর ডিঙিয়ে কলেজের ঘটিজল পান করছে। অথচ এমনি একদিন ছিল, যেদিন আমি এক বললে সে দুই বলতো! আমি দুই বললে সে বলতো তিন! অবশ্য আমিও কম যেতাম না সেই শিশুদিন; ওতেই বাড়িয়ে নিতাম আমাদের দুজনের টুনটুনি মনের ঋণ। অবশ্য সেও কম যেত না, আমি একটা চিমটি কাটলে সে আমাকে একটা কিল দিত। আমি একটা বাঁকা কথা বললে সে হাজারটা বাঁকা কথা আমার শরীরের দিকে ছুঁড়ে মারতো। কথা, অকথা, উপকথা আর রূপকথা এরা সবাই মিলেমিশে আমাদের হাজারটা সকাল, বিকাল আর সন্ধ্যা গিলে খেতো। একদিন না খেললে আমাদের রাতের ঘুম হারাম হতো। পথ ভুলে অন্যবাড়ি গিয়ে আহাজারি করতে হতো। পেটের ভাত সরল অংকের এতো গরল হয়ে যেতো। যেদিন ডাকসই, কানামাছি, বউচি খেলার মতো যথেষ্ট পার্টনার পাওয়া যেতো না, সেদিন আমরা ঝগড়া ঝগড়া খেলতাম। মিছিমিছি খেলতে খেলতে কোনদিন হয়ত তা সত্যিকার ঝগড়ার রূপ পরিগ্রহ করতো। অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই আবার হাওয়াই মিঠাইয়ের মত জিবের জলে ঝগড়া মিটে যেতো। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, জলের ভেতর জল কতো সহজেই না খুঁজে পায় বল! কিন্তু সেই জলই যে একদিন আগুন হবে, তা কে জানতো?

যেই লাল পেড়ে ওড়নার কথা বলছিলাম, সেই ওড়নার কাণ্ডজে নাম নীলাদ্রি। আদুরে নাম নীলা। চারাগাছ সময় থেকেই খুব ছটফটে। অনেকটা ডানপিটে টাইপ। তার মুখে তখন ঝিকর গাছের আঠার এতো হাসি লেগেই থাকতো। আমার চোখে

সেই হাসিতে বাগানে ফুল ফুটতো! অবশ্য অন্যদের কাছে ব্যাপারটা তেমন নয়। একেবারেই ভিন্ন ! তবে আমি জানি, যে কোনো মানুষকেই হাসিতে সুন্দর লাগে। সাজানো-গোছানো আধুনিক ডিজাইনের বিল্ডিংয়ের মত সুরম্য লাগে। ময়ূরের পেখম মেলার মতো সুদৃশ্য লাগে।

এজন্যই আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, বিধাতার সমস্ত সৃষ্টির মাঝে হাসির চেয়ে সুন্দরতম আর একটিও নেই। কেননা সুন্দর হাসির জন্য চেহারার মানচিত্র কিছুমাত্র সুন্দর হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ফরসা হলেও যা; কালো হলেও তা। হাসি হলো এমনি সদ্যফোটা একটি ফুলের মতো। যার রূপের কোনো শেষ নেই। এই পৃথিবীতে সবকিছু বাসি হয়; কেবল বাসি হয় না হাসি! বোধ করি এই কারণেই হাসি ভালোবাসেন না এমন কোনো মানুষ এই পৃথিবীতে নেই।

অবশ্য আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, নীলার ক্ষেত্রে বিষয়টা একেবারেই সিক্সটি নাইন। একদমই উল্টা-পাল্টা। যে হাসিতে সবাইকে সুন্দর লাগে, সেই একই হাসিতে নীলাদ্রিকে খুব বিশ্রী লাগতো। অবশ্য এরও একটি নিগূঢ় রহস্য ছিল। রহস্য এখনও আছে। আর তা হলো নীলাদ্রির দাঁতের সাইজ। যে দাঁতের উপমা দেয়ার জন্য আমার পিপীলিকা মস্তিষ্কে কোনো দৃষ্টান্ত আপাতত নেই। অবশ্য আমার সে যোগ্যতাও নাই। তবে বলা যায়, কাবাডি খেলার সময় একজন খেলোয়াড় ধরা পড়লে প্রতিপক্ষের দুই-তিন-চার-পাঁচজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে যেমনটা দেখায়, নীলাদ্রির দাঁতও অনেকটা সেরকম।

সে যাই হউক, দেখতে দেখতে একটা সময় অসুন্দরও যেমন সুন্দর হয়ে দাঁড়ায়, ভুলও যেমন করে ফুল হয়ে যায়–তেমনি আমারও হয়েছিল ঠিক তাই। অবশ্য নীলাদ্রি না হাসলে কিছুই বুঝা যেতো না। আমি জানি, নীলাদ্রির এই রকমের দাঁতও এক বিশেষ ধরনের শিল্প। একটি স্পেশাল নান্দনিক আর্ট। আমার কাছে প্রতিটি অন্ধকারের, অসুন্দরের যেমন আলাদা গুরুত্ব আছে, তেমনিভাবে প্রতিটি বিদঘুটে জিনিসেরও আলাদা আলাদা মূল্যমান আছে। যে হাসিতে নীলাদ্রির মুখে অমাবশ্যার চাঁদ উঠতো, তার সেই হাসিও আজ আর নেই। ব্রহ্মপুত্রের বালুচর দেখতে কার ভালো লাগে? অথচ একদিন আমাদের এমনি এক সারস দিন ছিল, ছোট কবিতার মত প্রাণের উচ্ছ্বাস ছিল; ছোটগল্পের মতো শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার আনন্দ ছিল; এখন সেইসব কেবলই বাসিফুলের মতো বাসি। তবুও আমি আলো যেমন ভালোবাসি, তেমনি অন্ধকারকেও ভালোবাসি। তবে সে ভালোবাসার স্বরূপ অথবা অরূপ অথবা কুরূপ কোনোটাই আমার জানা নেই। সেকি জলের মতো নাকি কোনো মৌসুমি ফলের মতো, আমি এখন তাও খুব একটা জানি না। জানতে চাইও না। এ যেনো ঠিক সেই উপমার মতো বাগানের ফুল আর নদীর কূল, ওদের যেমন খুশি ভালোবাসা যায়। গায়ে, গতরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করা যায়। কেউ বাগড়া দেয় না, কারো যেনো বাগড়া দেয়ার অধিকার নেই। অধিকার থাকতেও নেই।

আমার সেই নীলাদ্রির চারকূলে সবাই আছেন। একটি অশিক্ষিত গ্রামে শিক্ষিত মা-বাবা আছেন। তার বাবার একটা সরকারি চাকুরি আছে। দাদা-পরদাদার রেখে যাওয়া মস্তহাতির মতোন জমি-জিরাত আছে। বংশের গৌরব করার মতো নামের

শেষে একটা চৌধুরি আছে। সাত গেরামে তাদের পরিবারের চাঁদ-সুরুজের মতো মান-ইজ্জত আছে। তারচেয়েও বড়ো কথা মেডিকেলপড়ুয়া একজন মহালাবণ্যময় ভাইজান আছেন। সেই ভাইজানের সরকারি মেডিকেলে চান্স পাওয়ার মতো একটা হৈ হৈ রৈ রৈ খবরের সুখানুভুতি আছে।

সেই ভাইয়ের বোন হওয়ার মতো এমন একটা গৌরবের পীটস্থান আছে। অহংকারের জলজ্যান্ত অনেক নিমিত্ত আছে। দশ গেরামের মানুষ তার ভাইকে একনজর দেখতে আসার সুখস্মৃতি আছে। তারচেয়েও বড় ব্যাপার হল, একই গ্রামে বসবাস করেও পুরো গ্রামবাসির কাছে তালগাছের মতো তাদের আলাদা একটি সম্মান আছে।

তবে সুবিধের দিকটি হলো, নীলাদ্রিরা নিজেদেরকে তালগাছ মনে করে না। শেওড়া গাছ মনে করে। শেওড়া গাছ থেকে ছাগল যেমন বুকে ভর দিয়ে ডাল নুইয়ে পাতা খেতে পারে, তেমনি এই পরিবারটির কাছ থেকেও অনেকেই নানান পন্থায় সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। কেউ জমিতে বর্গা দেয়। আর কেউ পুকুরের মাছ ধরতে গিয়ে পুকুরচুরিও করে। মোদ্দাকথা, সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে এরা একান্ত আপনজন। শেওড়া গাছের মতো উপকারি বন্ধু। তবে দুই-একটি উঠতি ফ্যামিলি এসব ভালো চোখে দেখে না। এরা শিকারি বিড়ালের মতো ঘাপটি মেরে অপেক্ষায় থাকে। সুঁই ঢুকানোর মতো জায়গা না পেলেও শাবল ঢুকাতে চায়। এই একটিমাত্র জায়গাটায় গ্রামের চেয়ে শহরের প্রাণহীন মানুষগুলো ঢের ঢের ভালো। ওরা অনেকটা পেঁচার মতো একা একা থাকে। থাকতে পছন্দ করে। কাউকে ঘাটাঘাটি করার মতো এতো সময় তাদের নাই। তাদের কেবল রাত আছে। দিন নাই। আর কীভাবেই বা থাকবে? তারা যে যার কাজের কাছে দিন বিক্রি করে দিয়েছে!

তবুও গ্রামকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা এখনো তেলাপোকার মতো বেশ টিকে আছে। তবে গ্রাম্য মোড়ল আর মাতুব্বরদের দিন একবারে চুলোয় গেছে। একদিন যে মাতবররা সমাজে ঝগড়া-বিবাদ জিওল গাছের আঠার মতো জিইয়ে রেখে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের নিকট থেকে সুবিধা নিতো, এখন তাদের ভীষণ খরা। এককাপ চা-ও কেউ সাধে না। সালাম-কালাম দেয় না। দিতে চায় না। উপরি হিসাবে তাদের নাকের উপর দিয়ে নতুন জুতা পায়ে, ছাতা হাতে মচমচ করে হেঁটে যায়। মাতুব্বরদের কখনো চেনে। কখনো চেনে না। জমিদারি প্রথার পতনের পরও মাতব্বর শ্রেণি তাদের মাতুব্বরি অনেকদিন ডিমে তা দেয়ার মতো টিকিয়ে রেখেছিল। শিক্ষা-দীক্ষা আর আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে এখন তার আমুল পরিবর্তন হয়েছে। তবে একে শুধু পরিবর্তন বললে ভুল বলা হবে; বলা চলে একপ্রকার বিবর্তন। তা না হলে মাতুব্বর ঘরের বছরে কামলাটাও এখন কীভাবে আমলার মতো আচরণ করে? শিলিংফ্যানের নিচে দুই পা ফাঁক করে রাজার এতো ঘুমায়। নাকে ছয়ফোরের বাঁশির সুর বিনা পয়সায় শোনা যায়। সুন্দরি বউয়ের সাথে কামলারা যখন পান চিবুতে চিবুতে ঠোঁট লাল করে মস্কারা করে, সিনেমা দেখতে যায়; তখন এসব দৃশ্য দেখে কোমর ভাঙ্গা সিংহের মতো মাতুব্বরদেরও কেবল

সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসংযতভাবে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অবশ্য এ ছাড়া তাদের এখন আর তেমন কিছুই করারও নেই।

এমনি সুখেন হাওয়ায় পুঁইশাকের লকলকে ডগার মতো বেড়ে উঠেছে নীলাদ্রি চৌধুরী ওরফে নীলা ওরফে নীল। তার চারপাশের মানুষগুলো এখন আকস্মিক বন্যার জলের মতো স্বাধীনতা প্রিয়। কেউ কাউকে কোনোপ্রকার তোয়াক্কা করে না। করার প্রয়োজন বোধ করে না। তারা প্রত্যেকেই যেনো এক একটা আলাদা গ্রহের বাসিন্দা। শুধু এখানেই শেষ নয়, তারা সবাই এখন নিজ নিজ গ্রহের রাজা-মহারাজা। যে যার মতো থাকতে পছন্দ করে, যে যার মতো বলতে পছন্দ করে, সুঁইয়ের ছিদ্রে আনক্লিন বাঁশ দিতে পছন্দ করে। তবুও গ্রামের জীবন বসে থাকে না। সেও চালতা পাতার মতো পিলপিল করে চলতে থাকে। যখন বাতাস আসে; তখন জীবন টের পাওয়া যায়; আর যখন বাতাস নাই,তখন তাদের জীবনও নাই!

তবে আমার ধারণা, এমনি সুখেন হাওয়া এখন যতোটুকু অবশিষ্ট আছে; ততোটুকুও থাকবে না। আমি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অচিরেই হয়ত এমনি এক প্রবল ঝড় আসবে; যে ঝড়ে আমাদের দেশের গ্রামকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থা বলতে একেবারেই কিছু থাকবে না। সিঙ্গাপুর অথবা হংকংয়ের মতো গোটা দেশটাই একটা জাজ্বল্যমান শহরে পরিণত হবে। অর্থ-বিত্ত আর আলোক বদলে দিবে সবকিছু। হাটে-ঘাটে, খেলার মাঠে সবখানেই পাওয়া যাবে কেবল মানুষ আর মানুষ। কোথাও মন নেই। মনন নেই। চড়ুইপাখির প্রেমের মতো নরনারীর প্রেম হবে। শেয়াল, কুকুর, বিড়াল ওরাও আমাদের দেখে মুচকি মুচকি হাসবে। হাততালি দেবে। গীটার বাজাবে। তবলা বাজাবে। তবুও আমাদের কচুপাতার জীবন থেমে থাকবে না। থেমে থাকতে পারবে না। গতি আর প্রগতি তাদের সামনের দিনে পোশাকপরা অথচ উলঙ্গ মানুষের দিকে সগৌরবে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে!

দুই

এখন আমার কিছু কথা আমিই বলব। আমাকেই বলতে হবে। আমার কথা আমাকেই ভাবতে হবে। কারণ কাল এখন এমন যে, অন্যকেউ বলবেও না। ভাববেও না। অন্যকেউ বললে হয়ত বেলুনের মতো ফুলিয়ে দিবে; আর নয়ত বেলুন ফুটা করে দেবে। ফলে আমার সত্যিকারের পরিচয় কোনদিনই আর কারো জানা হবে না। আমার জানা এবং বিশ্বাস মতে, সবকথাই এমন এক আগুন যে তা একদিন না একদিন প্রকাশিত হবেই। সত্য হউক অথবা মিথ্যাই হউক। ছাই কিংবা ভাই কোনোটা দিয়েই আগুন কোনদিন ঢেকে রাখা যায় না। কারণ কথারা অনেকটা চিরজীবী। পরমাণুর কণাদের মতো। তাদের মৃত্যু নেই। ঝরা নেই। রোগ, ব্যাধি তাও নেই। মুখ থেকে একটি কথা বা আওয়াজ বের হওয়ার সাথে সাথে তা ইথারে মিলিয়ে যায়। তবে হারিয়ে যায় না। বিপুল বিত্ত এবং বৈভবে মহাকালের অতল গহ্বরে সংরক্ষিত হয়। আমার ধারণা, এমন একদিন আসবে যেদিন বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে হাজার বছর, লক্ষ বছর বা কোটি কোটি বছর আগের মানুষের কথা এবং কাজকর্মের অডিও-ভিডিও দেখাতে সক্ষম হবেন। হয়ত সেদিন খুব বেশি দূরেও নয়। তবে যে কথা যতোবেশি অপ্রকাশিত থাকবে সেকথা ততো বেশি শক্তি অর্জন করবে। অতঃপর একদিন বারুদে আগুন লাগার মতো চারপাশ জুড়ে বিস্ফোরিত হবে। হতেই হবে। এই যেমন মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, অসত্যকে, অসুন্দরকে, মিথ্যাকে মানুষ ঢেকে রাখতে চায়। তা ভাঙ্গা কুলা দিয়েই হোক অথবা ছাই দিয়েই হোক। কিন্তু কয়দিন ঢেকে রাখতে পারে? বেশিদিন পারে না। সঞ্চিত সত্য-মিথ্যারা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির লাভার মতো জমতে জমতে এক সময় মহাবিস্ফোরণ ঘটায়। আর সেই বিস্ফোরণে একসময় অসত্য, অসুন্দর খড়খুটোর মতো বাতাসে উড়ে যায়। তারচেয়ে বরং মহাশক্তি অর্জন করার আগেই তাদের অবমুক্ত করে দেওয়া উচিত। এমনি একটি কথার স্মৃতি আমার পাঁজরে বুঁদ হয়ে আছে। তবে সে আমার পয়লা নাম্বার স্মৃতি কিনা আমি সঠিক জানি না। তবে শুধু এতটুকু বলতে পারি, শ্রদ্ধেয় বড় ভাইয়ার মুখে শোনা এ আমার সামান্য জীবনের প্রথম অসামান্য স্মৃতির ফেনা!